LEARN GEETA
तस्मात् योगी भवार्जुन

॥ श्रीहरि ॥
বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূরমর্দনম্।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দেজগদ্গুরুম্।।

॥ गीता पढ़ें, पढ़ायें, जीवन में लायें ॥

॥ শ্রীমদ্ভগবদগীতা বিবেচন সারসংক্ষেপ ॥

অধ্যায় 14: গুণত্রয়বিভাগযোগ

1/2 (শ্লোক 1-8), শনিবার, 30 ডিসেম্বর 2023

ব্যাখ্যাকার: গীতা প্রবীণ মাননীয়া কবিতা বর্মা মহাশয়া

ইউটিউব লিঙ্ক: https://youtu.be/6F9VU6LC03s

প্রকৃতিজাত ত্রিগুণের ধর্ম

হরিনাম সংকীর্তন, হনুমান চালিসা পাঠ ,মা সরস্বতীর বন্দনা ও দীপ প্রজ্জ্বলনের পর আজকের এই বিবেচন সত্রের শুভারম্ভ হয়।

চারধাম যাত্রার প্রথম স্তরে আমরা দ্বাদশ অধ্যায় (ভক্তিযোগ) এবং পঞ্চদশ অধ্যায় (পুরুষোত্তম যোগ) এবং দ্বিতীয় স্তরে এই অবধি ষোড়শ অধ্যায় (দৈবাসুরসম্পদবিভাগ যোগ) এবং নবম অধ্যায় (রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগ) অধ্যয়ন করেছি এবং বিবেচন সত্রসমূহের মাধ্যমে এই অধ্যায়সমূহের গূঢ় অর্থ জানার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে।

আজকের বিবেচনসত্রের আলোচ্য বিষয় হল গীতার চতুর্দশ অধ্যায় অর্থাৎ গুণত্রয়বিভাগ যোগ। এই অধ্যায়ে ভগবান আমাদের মনস্তত্ত্ব, মানসিক ক্রিয়া, মানসিক প্রকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন যার দ্বারা পরমাত্মপ্রাপ্তির পথ সুগম হয়।

মন হল মানুষের সবথেকে শক্তিশালী হাতিয়ার যা মানুষের বন্ধু হতে পারে আবার শত্রুও হতে পারে। যিনি মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন তিনি জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সফল হন। জীবনে সফলতা কীভাবে পাওয়া যায়, এই অধ্যায়ে ভগবান সেই উপদেশ দিয়েছেন।

সফলতা কি এবং মানুষ কেন জীবনে তা চায়?

জাগতিক বিষয় বা সংসারে কিছু পাবার আকাঙ্ক্ষায় মানুষ কর্ম করে এবং সফল হলে সুখী হয়। অর্থাৎ সুখ প্রাপ্তিই হল আসল লক্ষ্য। এই জগতে সবাই সুখী হতে চায়। কর্মের অসফলতা হেতু দুঃখ বা ব্যথা মানুষ ভোগ করতে চায় না। তাই কোন মানুষকে সুখী দেখলে আমাদের এটাই অনুভব হয় যে সেই ব্যক্তি জীবনে সফলতা অর্জন করেছে।

প্রত্যেকেরই সুখের ভিন্ন ভিন্ন মাপকাঠি থাকে। যেমন কোন মেধাবী ছাত্র পরীক্ষাতে প্রথম হলে সুখী হয় কারণ তার এই সাফল্যের জন্য সবাই তার প্রশংসা করে। কেউ যা অর্জন করে তার জন্য প্রশংসিত হলে সুখী হয়। কিছু লোক নতুন দক্ষতা এবং জ্ঞানার্জনে সুখ খুঁজে পায় যা তাদের সুখী ও তৃপ্ত করে। কেউ প্রচুর অর্থ উপার্জন করে বড় প্রাসাদ কেনার জন্য, বিলাসবহুল জীবন যাপনের জন্য এবং সব কিছু নিজের দখলে রাখার জন্য এবং এটিই তার সুখের ও সফলতার মাপকাঠি।

যদিও কর্মে সাফল্য অর্জনের জন্য সবাই চেষ্টা করে তথাপি মনের অস্থিরতা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে এবং কাম্য লক্ষ্য প্রাপ্তিতে বাধার সৃষ্টি করে।

উদাহরণস্বরূপ দুই ধরনের ছাত্রের কথা ধরা যাক। একজন যে ৮০% নম্বর পেয়েছে আর একজন যে ৯০% এরও বেশী নম্বর পেয়েছে। ছাত্রদ্বয়ের মেধা এবং বুদ্ধিমত্তা প্রায় একই কিন্তু পরীক্ষার ফলের তারতম্যতার কারণ হল প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতা। প্রথম ছাত্রটি পড়াশোনায় অনিয়মিত, কখনও অনেকক্ষণ পড়ে আবার কখনও একদম পড়াশোনা করেনা। অন্যদিকে দ্বিতীয় ছাত্রটি নিয়মিত ভাবে পড়াশোনা করে তা অল্প কয়েক ঘণ্টার জন্যই হোক না কেন। প্রথম ছাত্রটির তুলনায় দ্বিতীয়জনের একাগ্রতা ও মানসিক সংযম অনেক বেশী। ছাত্রের দায়িত্ব হল নিয়মিত পড়াশোনা করা এবং শিক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত অনুশীলন সম্পূর্ণ করা। নিয়মানুবর্তিতা, অধ্যাবসায় ও মানসিক সংযমই যে কোন ছাত্রের সাফল্যতার মূল কারণ।

যে কোন সফলতা অর্জনের জন্য প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতা ও অধ্যাবসায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তা একমাত্র মানসিক সংযম দ্বারাই প্রাপ্ত হয়।

গীতা পরিবারের ক্লাসেও আমরা দেখি যে কিছু সাধক অনায়াসে শ্লোকের শুদ্ধ উচ্চারণ করতে সমর্থ হন আবার কেউ কেউ প্রতিদিন ক্লাসে উপস্থিত থেকেও অসমর্থ। এর মূল কারণ হল অধ্যাবসায় ও মানসিক সংযমের অভাব।

মন এবং তার সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতাকে সংযত রাখতে হলে আমাদের মনের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বুঝতে হবে। আমাদের মনের উপর প্রকৃতিজাত গুণসমূহের প্রভাবে যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়, ভগবান এই অধ্যায়ে সেই ত্রিগুণের বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এই অধ্যায়ের সূত্রপাত করতে গিয়ে প্রথম দুটি শ্লোকে ভগবান জ্ঞানের মহিমা বর্ণনা করেছেন।

14.1

শ্রীভগবানুবাচ

পরং(ম্) ভূয়ঃ(ফ্) প্রবক্ষ্যামি, জ্ঞানানাং(ঞ) জ্ঞানমুত্তমম্
যজ্‌জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ(স্) সর্বে, পরাং(ম্) সিদ্ধিমিতো গতাঃ॥1॥

শ্রীভগবান বললেন - আমি আবারও বলবো সকল জ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (এবং) সর্বোত্তম জ্ঞান, যা জেনে সমস্ত ঋষিরা এই জগৎ থেকে পরম সিদ্ধি লাভ করেছেন (মুক্ত)।

যে জ্ঞান অর্জন করলে মানুষ এই সংসারের জন্ম-মৃত্যুর আবর্তন থেকে মুক্ত হয়ে পরমাত্মা লাভে সক্ষম হয়, সেই জ্ঞান তিনি পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে দিলেও পুনরায় এই অধ্যায়ে উপস্থাপন করেছেন। মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে একই জ্ঞান পুনরায় বলার উদ্দেশ্য কী ?

অনেক সময় দেখা যায় যে মা তাঁর শিশুসন্তানকে যখন খাওয়ান, শিশুটি অল্প খাবার পর আর খেতে চায় না। কিন্তু মা যতক্ষণ উপলব্ধি করেন যে বাচ্চাটির পেট খালি আছে , ততক্ষণ জোর করে হোক বা গল্প বলে বলেই হোক, মা বাচ্চাকে খাওয়াতে থাকেন। সন্তানের খাবারের পরিমাণ সম্পর্কে বাচ্চাটির থেকে মায়ের অভিজ্ঞতা বেশী। ঠিক তেমনি পরমেশ্বরও জানতেন যে বিভ্রান্তি দূর করার জন্যএই জ্ঞানের কথা অর্জুনের বার বার শোনা প্রয়োজন। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন যে প্রকৃতির গুণসংগবশতই জীবের ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্ম ও সুখদুঃখ ভোগ অর্থাৎ সংসারিত্ব। এই গুণসমূহের লক্ষণ কী এবং এরা কীভাবে জীবকে আবদ্ধ করে, কিরূপে প্রকৃতি হতে বিবিধ সৃষ্টি হয়, ইত্যাদি সম্পর্কে বিশদভাবে কিছু বলা হয় নি। সেই হেতু এই প্রকৃতি-তত্ত্ব বা ত্রিগুণ-তত্ত্ব ভগবান পুনরায় এই অধ্যায়ে অর্জুনকে এবং পরোক্ষভাবে মানব-সমাজকে জানিয়েছেন ।

চাহিদা ও প্রয়োজন সর্বদা সমান হয় না। উদাহরণস্বরূপ, একজন বিলাসবহুল অট্টালিকায় বাস করতে চাইতে পারেন কিন্তু তার প্রয়োজন কেবলমাত্র একটি ঘর। একইভাবে আমরা অল্পসময় ধ্যান করে কাম্য-ফল চাইতে পারি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধ্যানের কাম্য ফল পেতে গেলে আমাদের দীর্ঘ সময় ধরে ধ্যান করা প্রয়োজন ।

গীতার সব অধ্যায়গুলি শেখার পর কেউ মনে করতে পারে যে সে গীতা সম্বন্ধে জ্ঞানী কিন্তু এই বিশাল এবং পরম জ্ঞানকে গভীরভাবে জানতে গেলে তাকে ধারাবাহিক ভাবে প্রত্যহ শ্লোকগুলির চর্চা করতে হবে এবং তা বুঝতে হবে। সংসার-বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে পরমাত্মাকে লাভ করার জন্য ভগবান গীতায় বিভিন্ন যোগের যথা কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ,ভক্তিযোগ ইত্যাদির ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু বিশেষ জোর দিয়েছেন কর্মযোগে যেহেতু মানব জীবন তার কর্মের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। গীতা হল জ্ঞানের সমুদ্র যার মধ্যে গভীর দর্শন রয়েছে। অনেক সাধুরা যেমন আদি শঙ্করাচার্য্য, রামসুখদাসজী, বল্লভাচার্য্যজী, মধুসূদন সরস্বতীজী এবং আরও অনেক জ্ঞানীগুণীজন তাঁদের ভাষ্য রচনায় তা বিস্তারিত ভাবে লিখেছেন। শুধু তাই নয়, ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানী মনিষীগণ একেকটি শ্লোক ভিন্ন ভিন্ন ভাবেও ব্যাখ্যা করেছেন।

জ্ঞান লাভ করা সহজ কিন্তু তার প্রয়োগ কঠিন। একজন গীতার অন্তর্নিহিত জ্ঞান প্রাপ্ত করতে পারে, কিন্তু সেই জ্ঞান নিজের জীবনে এবং কর্মে প্রয়োগ করা অত্যন্ত দুরূহ।

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে ।
ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ।।১২.১২।।

দ্বাদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে অসচেতন হয়ে অভ্যাস করার থেকে জ্ঞান শ্রেয়। জ্ঞানের থেকে ধ্যান শ্রেয়তর এবং কর্মফলত্যাগ ধ্যান হতেও শ্রেষ্ঠ। তাই জ্ঞান তখনই সত্যিকারের কাজে লাগে যখন কেউ তা নিজের জীবনে প্রয়োগ করে। যেমন কেউ যদি গীতা থেকে অর্জিত জ্ঞান নিজের জীবনে প্রয়োগ করেন তাহলে তিনি তার প্রত্যেক সমস্যার সমাধান খুঁজে পাবেন। প্রয়োগ ছাড়া জ্ঞান **'শব্দ'** মাত্র এবং অর্থহীন।

লৌকিক ও পারলৌকিক যতপ্রকার জ্ঞান আছে অর্থাৎ যতপ্রকার বিদ্যা, কলা, ভাষা, লিপি ইত্যাদির জ্ঞান আছে, তাদের মধ্যে প্রকৃতি-পুরুষের পার্থক্য জানানো এবং পরমাত্মাকে প্রাপ্তি করানোর যে জ্ঞান তা সর্বোৎকৃষ্ট। ভগবান এখানে সেই সর্বোত্তম জ্ঞানের কথা বলেছেন যার সমকক্ষ অন্য কোনো জ্ঞান নেই কারণ অন্য সমস্ত জ্ঞান মানুষকে সংসারে আবদ্ধ করে এবং যার পরিনাম দুঃখ। ভগবান বলেছেন যে এই পরম জ্ঞান লাভ করে মুনিগণ সংসারের বন্ধন হতে মুক্তি লাভ করেন এবং পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন। তত্ত্বমননকারী যেসব ব্যক্তির শরীরের সাথে একাত্মতা থাকে না, তাঁদের 'মুনি' বলা হয়।

'পরাং সিদ্ধিম্' কথাটির তাৎপর্য্য হল যে এই পরমাত্মপ্রাপ্তি-রূপ যে সিদ্ধি , তা সর্বোৎকৃষ্ট কারণ সেটি প্রাপ্ত হলে মানুষ জন্ম-মৃত্যু চক্র হতে মুক্ত হয়ে যায়।

14.2

ইদং(ঞ) জ্ঞানমুপাশ্রিত্য, মম সাধর্ম্যমাগতাঃ
সর্গেপি নোপজায়ন্তে, প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥2॥

এই জ্ঞানের আশ্রয় নিয়ে যারা আমার ধার্মিকতা লাভ করেছে, (তারা) মহাকাহিনীতেও জন্ম নেয় না এবং মহাপ্রলয়েও দুঃখ পায় না।

'ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য' — পূর্ববর্তী শ্লোকে ভগবান যে জ্ঞানের মহিমা জানিয়েছিলেন, সেই জ্ঞান অনুভব করাই হল আশ্রয় নেওয়া। সেই জ্ঞান অনুভূত হলে মানুষের সংশয় দূর হয় এবং তিনি জ্ঞানস্বরূপ হয়ে উঠেন।

'মম সাধর্ম্যমাগতাঃ' — এই জ্ঞানের আশ্রয় নিয়ে মানুষ আমার অর্থাৎ ভগবানের সাধর্ম্য প্রাপ্ত হয়। **সাধর্ম্য** শব্দের মানে হল স্বরূপতা অর্থাৎ ভগবান যেমন ত্রিগুণাতীত, সর্বদাই নির্লিপ্ত ঠিক তেমনি তাঁরাও এই ত্রিগুণাতীত অবস্থা, নির্লিপ্ততা এবং নির্বিকারত্ব লাভ করেন।

'সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে' — নবম অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন --- নিষ্পাপ ব্যক্তি স্বর্গপ্রাপ্তির কামনা করে পুণ্যকর্ম করেন

এবং ফলস্বরূপ ইন্দ্রলোক লাভ করেন এবং সেখানে দিব্যভোগসমূহ উপভোগ করেন। ভগবান পুনরায় বলেছেন —

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।

এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ।।৯.২১।।

অর্থাৎ সেই ব্যক্তিসকল স্বর্গসুখ ভোগ করে পুণ্যক্ষয় হলে পুনরায় মৃত্যুলোকে ফিরে আসেন। এইভাবে তিন বেদে কথিত সকাম ধর্মের আশ্রয় গ্রহণকারী কামনা-পরবশ ব্যক্তিরা জন্ম-মৃত্যু প্রাপ্ত হন।

এখানে ভগবান বলেছেন যে এই সর্বোত্তম জ্ঞানের অধিকারী মহাপুরুষগণ মহাসর্গের প্রারম্ভে উৎপন্ন হন না অর্থাৎ কর্মফল ভোগের জন্য তাঁদের পুনর্বার শরীর ধারণ করতে হয় না।

‘প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ’ — মহাপ্রলয়ে যখন সমস্ত জীব ব্যথিত হয় এবং নাশপ্রাপ্ত হয় তখনও সেইসব জ্ঞানী মহাপুরুষগণ ব্যথিত হন না, তাঁদের মধ্যে কোন চাঞ্চল্য হয় না।

মহাসর্গেও সৃষ্ট না হওয়া এবং মহাপ্রলয়েও ব্যথিত না হওয়ার তাৎপর্য্য হল এই যে, জ্ঞানী মহাপুরুষদের প্রকৃতি এবং প্রকৃতিজাত গুণাদি হতে সর্বতোভাবে সম্বন্ধ-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকলে মানুষ জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবদ্ধ হয়, দুঃখ হয়, মনে চাঞ্চল্যতা ইত্যাদি হয়, কিন্তু প্রকৃতির সাথে সম্পর্করহিত মহাপুরুষগণ চিরকালের মত জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তিলাভ করেন।

14.3

মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম , তস্মিন্ গর্ভং(ন্) দধাম্যহম্
সম্ভবঃ(স্) সর্বভূতানাং(ন্), ততো ভবতি ভারত॥3॥

হে ভারতবংশোদ্ভব অর্জুন! আমার আদি প্রকৃতিই উৎপত্তিস্থল (এবং) আমি এতে আত্মার গর্ভ স্থাপন করি। তা থেকে সমস্ত প্রাণীর জন্ম হয়।

যিনি ভগবানের সাধর্ম্য প্রাপ্ত হন, তিনি মহাসর্গে উৎপন্ন হন না, কিন্তু যে সকল প্রাণী মহাসর্গে উৎপন্ন হয় তাদের সৃষ্ট হওয়ার কী প্রক্রিয়া — সে কথা ভগবান এই শ্লোকে জানিয়েছেন।

‘মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম’ — ভগবান এখানে তাঁর প্রকৃতির কথা উল্লেখ করেছেন । সাংখ্য-দর্শনে যাকে প্রকৃতি বলা হয়েছে সেটিই বেদান্ত-দর্শনে মায়া। এখানে মূল প্রকৃতিকে ‘মহদব্রহ্ম’ বলা হয়েছে। জাগতিক দৃষ্টিতে মূল প্রকৃতিই সব থেকে বৃহৎ বস্তু। পরমাত্মা ব্যতীত জগতে এর থেকে বড় কোন ব্যাপক তত্ত্ব নেই। সেইজন্য এই মূল প্রকৃতিকে ‘মহদব্রহ্ম’ বলা হয়েছে।

নবম অধ্যায়ে ভগবান প্রকৃতির কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন —

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে।।৯.১০।।

অর্থাৎ ভগবানের অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি এই জগৎ সৃষ্টি করে। সেই হেতু জগতের নানাপ্রকার পরিবর্তন হয়।

সকলের উৎপত্তি স্থান হওয়ায় এই মূল প্রকৃতিকে ‘যোনি’ বলা হয়েছে।

‘তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্’ — অর্থাৎ প্রকৃতিতে ভগবান গর্ভস্থাপন করেন। আসলে ভগবান কোনো নতুন গর্ভস্থাপন করেন না। অনাদিকাল থেকে যে জীবগণ জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে পড়ে আছে, তারা মহাপ্রলয়ের সময় নিজ নিজ কর্মসংস্কারসহ প্রকৃতিতে লীন হয়ে যায়। মহাসর্গের প্রারম্ভে ওই সকল জীবকে ভগবান তাদের স্বীয় প্রাক্তন কর্মানুসারে প্রকৃতির সঙ্গে পুনরায় সংযুক্ত করে দেন।

‘সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত’ — অর্থাৎ ভগবানের সৃষ্টি-সঙ্কল্পের ফলে সমস্ত প্রাণীর সৃষ্টি হয় এবং প্রাণী সূক্ষ্ম ও স্থুল শরীর ধারণ করে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের সৃষ্টি-সংকল্পই গর্ভধানস্বরূপ। প্রকৃতির স্বতন্ত্র সৃষ্টি-সামর্থ্য নেই। উদাহরণস্বরূপ বৈদ্যুতিক পাখা একটি জড় পদার্থ যার নিজস্ব কোন কর্মক্ষমতা নেই, কিন্তু বিদ্যুতের সংযোগে পাখার কর্মক্ষমতা উৎপন্ন হয়। একইভাবে প্রকৃতিও ততক্ষণ নিষ্ক্রিয় থাকে যতক্ষণ না পরমেশ্বর তাতে সঠিকভাবে কাজ করবার শক্তি অর্থাৎ চৈতন্য প্রদান করেন।

14.4

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় , মূর্তয়ঃ(স্) সম্ভবন্তি যাঃ
তাসাং(ম্) ব্রহ্ম মহদ্যোনিঃ(র্), অহং(ম্) বীজপ্রদঃ(ফ্) পিতা॥4॥

হে কুন্তীনন্দন! সমস্ত প্রাণীর মধ্যে যে সমস্ত দেহের জন্ম হয় তার আদি প্রকৃতি হল মাতা (এবং) আমিই পিতা যিনি বীজ স্থাপন করেন।

শাস্ত্রে উল্লেখিত চুরাশী লক্ষ যোনি হল সর্বপ্রকার প্রাণীর উৎপত্তি স্থান। এইরূপ চুরাশী লক্ষ যোনিতে যত দেহ অনাদিকাল থেকে উৎপন্ন হয়ে আসছে, তাদের সকলেরই আকৃতি-প্রকৃতি পৃথক পৃথক। **চুরাশী লক্ষ যোনিকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় —**

- **জরায়ুজ — জরায়ু দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে যে সব প্রাণী জন্মায়। যথা মানুষ, পশু ইত্যাদি।**
- **অণ্ডজ — অণ্ড অর্থাৎ ডিম হতে উৎপন্ন প্রাণী। যথা পক্ষী, সাপ ইত্যাদি।**
- **স্বেদজ — ঘাম হতে যে সকল প্রাণীর জন্ম হয়। যথা উকুন ইত্যাদি ।**
- **উদ্ভিজ —- মাটি ভেদ করে যা উৎপন্ন হয়। যথা বৃক্ষ, লতাদি।**

ভগবান বলেছেন যে এই যোনীসমূহ হতে উৎপন্ন সকল প্রাণীর মাতৃস্বরূপ হচ্ছে মহদ্‌ব্রহ্ম অর্থাৎ মূল প্রকৃতি। সেই মূল প্রকৃতিতে জীবরূপ বীজ বপনকারী পিতা হলেন স্বয়ং পরমাত্মা।

বিভিন্ন বর্ণ এবং আকৃতিবিশিষ্ট নানাপ্রকার শরীরে ভগবান তাঁর চেতন-অংশরূপ বীজ স্থাপন করেন। এতে প্রমাণিত হয় যে প্রত্যেক প্রাণীতে অবস্থিত পরমাত্মার অংশ শরীরের আকৃতির বিভিন্নতার জন্যই ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীত হয়। বাস্তবে সকল প্রাণীতেই এক অভিন্ন পরমাত্মাই বিদ্যমান।

14.5

সত্ত্বং(ম্) রজস্তম ইতি, গুণাঃ(ফ্) প্রকৃতিসম্ভবাঃ
নিবধ্নন্তি মহাবাহো, দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥5॥

ওহ মহান! সত্ত্ব, রজ (এবং) তম প্রকৃতি থেকে উদ্‌ভূত - এই (তিন) গুণগুলি অবিনশ্বর আত্মা।(জীবাত্মা) দেহে।

পূর্ববর্তী শ্লোকসমূহে ভগবান প্রাণীদেহের উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। পরমাত্মা এবং তাঁর শক্তি অর্থাৎ প্রকৃত

সংযোগে উৎপন্ন জীবসকল প্রকৃতিসম্ভূত গুণাদিতে কীভাবে আবদ্ধ হয় — এই শ্লোকটিতে সেই বিষয় নিয়ে ভগবান আলোচনা করেছেন।

'সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ' — তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে যে মূল প্রকৃতিকে 'মহদ্‌ব্রহ্ম' বলা হয়েছে, সেই মূল প্রকৃতি থেকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ —এই তিনটি গুণ উৎপন্ন হয়। এই তিনটি গুণ থেকেই অনন্ত বিশ্ব উৎপন্ন হয় । এই তিনটি গুণের অনুপাতের তারতম্যেই যে গুণটি প্রবল, জীব সেই গুণের অধিকারী হয় এবং প্রাণীদের মধ্যে নানাপ্রকার ভেদ হয়।

গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন—

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ ।।১৮.৪০।।

— অর্থ হল পৃথিবীতে, স্বর্গে, দেবতাদের মধ্যে অথবা এ ছাড়াও অন্য কোথাও প্রকৃতিজাত এমন কোন প্রাণী বা বস্‌তু নেই যে এই তিনটি গুণ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ) থেকে মুক্ত বা রহিত।

ষোড়শ অধ্যায়ে ভগবান দৈবগুণ এবং আসুরীক গুণের আলোচনা করেছেন। চিত্তের নির্মলতা, দৈবগুণাদি সত্ত্বগুণের স্বরূপ। দম্ভ, অহঙ্কার, আসক্তি ইত্যাদি রজোগুণের স্বরূপ এবং আলস্যতা,অজ্ঞানতা ইত্যাদি আসুরীগুণ তমোগুণের স্বরূপ।

রামায়ণের একটি সুন্দর গল্পের মাধ্যমে প্রকৃতির এই তিনটি গুনসমূহকে হৃদয়ঙ্গম করা যেতে পারে –

একদা লঙ্কাধিপতি রাবণ এবং তাঁর দুই সহোদর ভাই কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ ব্রহ্মার আরাধনার্থে কঠোর তপস্যায় ব্রতী হয়েছিলেন। তিন ভাইয়ের তপস্যায় সন্‌তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মাদেব আবির্ভুত হলেন এবং বর চাইতে বললেন। তিনজনই একই বর চাইলেন যা হল "সোনা"। (হিন্দিতে সোনা শব্দের অনেক অর্থ হয়।)

বিভীষণ ছিলেন সাত্ত্বিক। তিনি চাইলেন "সো...না"-- নিদ্রা ত্যাগ অর্থাৎ অজ্ঞানতার নিদ্রা। অজ্ঞানতারূপী নিদ্রামুক্ত হয়ে তিনি জীবনের অন্তিম লক্ষ্য অর্থাৎ পরমাত্মাপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সাধনা এবং ন্যায়পরায়ণতার পথ অনুসরণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

লঙ্কাধিপতি রাবণ ছিলেন রাজসিক। তিনি চাইলেন "সোনা" অর্থাৎ স্বর্ণ যা ক্ষমতা, যশ, বস্‌তুগত কামনার প্রতীক। যদিও রাবণ একজন বুদ্ধিমান ও শাস্ত্রজ্ঞানী পুরুষ ছিলেন কিন্‌তু তিনি রাজসিক গুণসম্পন্ন হওয়ায় দাম্ভিক ও অহংকারী ছিলেন। কামনার বশীভূত হয়ে তিনি মাতা সীতাকে হরণ করেছিলেন এবং পরিণামে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা রাবণ এবং তাঁর রাক্ষসকূল ধ্বংস হয়। রাবণের জ্ঞান ছিল কিন্‌তু তিনি সেই জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারেন নি কারণ তার অনেক বেশী বস্‌তুগত কামনা ছিল। অনেক সময় কারও মিষ্টির প্রতি লালসা থাকতে পারে এবং মিষ্টি খাওয়ার সেই অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছাটাই হল রাজসিক গুণ।

কুম্ভকর্ণ ছিলেন তামসিক, তিনি "সোনা" অর্থাৎ নিদ্রা চাইলেন। ছয়মাস ঘুমিয়ে থাকবেন এবং শুধু একদিন জেগে থাকবেন। অজ্ঞানতা ও আলস্যতার প্রতীক ছিলেন তিনি। ঘুমন্ত অবস্থায় জাগতিক সুখ, আনন্দ ভোগ করা যায় না। তামসিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তি ভালো-মন্দের তফাৎ বুঝতে পারে না।

যদি কোন ব্যক্তি অন্ধকার ঘরে থাকে, তাহলে সে স্বচ্ছ দৃষ্টির ক্ষমতা হারায় এবং পড়ে যাওয়ার ভয়ে কোন দিকেই আর এক পা এগোতে পারে না । এইভাবে অত্যাধিক তমগুণের প্রভাবে একজন ব্যক্তির দৃষ্টি অস্বচ্ছ হয়ে পড়ে এবং চিন্তাও বিভ্রান্তিকর হয়।

'নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্' — দেহী অর্থাৎ জীবাত্মা অবিকারী হলেও প্রকৃতির গুণসঙ্গবশতঃ দেহাত্মভাব প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই গুণসমূহ কাউকে আবদ্ধ করে না, প্রকৃতির এই ত্রিগুণপ্রধান কার্য, ধন-সম্পদ, শরীর ইত্যাদিকে আপন বলে মেনে নেওয়ায় দেহী স্বয়ং অবিনাশী হয়েও বিনাশশীল জড় শরীরে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। দেহী স্বয়ং একইভাবে বিরাজ করলেও গুণাদি এবং গুণাদির বৃত্তির অধীন হয়ে স্বয়ং সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক হয়ে পড়ে ।

শরীরের সঙ্গে 'আমি-আমার' সম্পর্ক স্থাপিত হলে জীবের সমস্ত জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন হয় এবং শরীরের প্রতি অহং ও মমত্ববোধ দৃঢ় হয়।
এখানে ভগবান সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ — এই তিনটি গুণে দেহী অর্থাৎ জীবাত্মার শরীরের সাথে আবদ্ধ হওয়ার কথা বলে সত্ত্বগুণের স্বরূপ এবং তার বন্ধনের প্রকার পরবর্তী শ্লোকে জানিয়েছেন।

14.6

তত্র সত্ত্বং(ন্) নির্মলত্বাৎ , প্রকাশকমনাময়ম্
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি, জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥6॥

হে পাপহীন অর্জুন! এই গুণগুলির মধ্যে সত্ত্ব উপাদানটি নির্মল (পরিচ্ছন্ন) হওয়ার কারণে, প্রকাশক (এবং) অপরিবর্তনীয়। (i) (শরীরকে) সুখের আসক্তি এবং জ্ঞানের সাথে সংযুক্ত করে।

ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে সত্ত্বগুণ নির্মল ও স্বচ্ছ এবং সেইজন্য এটি পরমাত্মতত্ত্বের জ্ঞানলাভের সহায়ক। সত্ত্বগুণ নির্মল ও স্বচ্ছ হওয়ায় এটি প্রকাশকারী। যেমন আলোর প্রকাশের অন্তর্গত বস্তুসমূহ পরিষ্কার দেখা যায় ঠিক তেমনি সত্ত্বগুণের আধিক্য হলে রজোগুণ ও তমোগুণের বৃত্তিগুলো স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে।

বস্তুত সত্ত্বগুণের দ্বিবিধ প্রকারভেদ আছে —- মিশ্র-সত্ত্ব অর্থাৎ রজস্তম-মিশ্রিত সত্ত্ব এবং শুদ্ধসত্ত্ব অর্থাৎ রজস্তমোবর্জিত সত্ত্ব। যদিও সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ — এই তিনটি গুণের পৃথক পৃথক লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে তবে প্রকৃতিজাত এই তিনটি গুণসমূহ কখনো পৃথক ভাবে থাকে না। ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে জীবের দেহে সর্বদা একসঙ্গে থাকে। একসাথে থাকা অবস্থায় অপর দুটি গুণের তুলনায় সত্ত্বগুণ প্রবল হলে যে লক্ষণ উপস্থিত হয় সেটিই মিশ্র সত্ত্বের লক্ষণ। শুদ্ধ-সত্ত্বের সার ধর্ম দুটি — আত্মজ্ঞান এবং আত্মানন্দ ।

মিশ্র-সত্ত্বগুণের মুখ্য ধর্ম দুটি — সুখ ও জ্ঞান । চিত্তে যখন সাত্ত্বিক বৃত্তি হয়, কোন বিকার থাকে না, তখন একপ্রকার সুখ অনুভব হয় , প্রশান্তি ভাব জাগে। সাধকের মনে তখন এই চিন্তা হয় যে এই সুখ ও শান্তি যেন চিরস্থায়ী হয়। কিন্তু সুখ ও শান্তি যখন নষ্ট হয় তখন মনে দুঃখ অনুভব হয়। এটি হল সত্ত্বগুণের সুখেতে আসক্তি। সাত্ত্বিক ব্যক্তি যজ্ঞানুষ্ঠান করেন এবং পুণ্যার্জনের ফলস্বরূপ তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ হয়। এই প্রাপ্তিতে যে সুখ অনুভব হয় সেই সুখ যেন সদাই বজায় থাকে এই ভেবে তিনি বারবার যজ্ঞানুষ্ঠান করেন এবং প্রাপ্ত সুখেতে তাঁর আসক্তি হয় যা বন্ধনকারক। এই সুখকে আত্মানন্দ বলে না। সুখ-দুঃখাদি ক্ষেত্রের ধর্ম অর্থাৎ দেহধর্ম, এটি আত্মার ধর্ম নয়।

সত্ত্বগুণের প্রভাবে সাধক নানাবিধ জ্ঞান অর্জন করেন। মিশ্র-সত্ত্ব অর্থাৎ রজঃ ও তমঃ গুণ মিশ্রিত থাকায় "আমি জ্ঞানী" –এই অহংভাবও বন্ধনের কারণ হয়।

এইভাবে সত্ত্বগুণ সুখ ও জ্ঞানের আসক্তির দ্বারা সাধককে আবদ্ধ করে। সত্ত্বগুণ জলের ন্যায় নির্মল হলেও অপর দুটি গুণের সাথে মিশ্রিত থাকায় বন্ধনের কারণ হয়। সত্ত্বগুণের খুব প্রাধান্য হলেও তা মোক্ষ-প্রাপ্তির অবস্থা নয়। সত্ত্বগুণ বাসনা ও অহংকারের দ্বারা জীবকে বন্ধন করে। সত্ত্বের বাসনা মহত্তর এবং সত্ত্বের অহঙ্কার শুদ্ধতর কিন্তু যতদিন এই বাসনা ও অহঙ্কার জীবকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখে ততদিন পরমাত্মাকে লাভ করা সম্ভব নয়।

পরমাত্মতত্ত্বই সর্বতোভাবে নির্বিকার হয় যা ত্রিগুণাতীত। সাধক যদি এই সুখ ও জ্ঞানে আসক্ত না হন তাহলে তিনি সত্ত্বগুণ থেকেও ঊর্ধ্বে আরোহণ করে নিজের ত্রিগুণাতীত স্বরূপ অনুভব করতে সক্ষম হন । একে পরমানন্দও বলা হয়, যা অবিনাশী এবং যা জাগতিক বন্ধন থেকে সাধককে মুক্ত করে।

মূল কথা এই —মিশ্র-সত্ত্ব সাধকের সাধনাবস্থার লক্ষণ এবং শুদ্ধ-সত্ত্ব যোগীর সিদ্ধাবস্থার লক্ষণ।

14.7

রজো রাগাত্মকং(ম্) বিদ্ধি , তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় , কর্মসঙ্গেন দেহিনম্॥7॥

হে কুন্তীনন্দন! রজোগুণকে (আপনি) বিবেচনা করুন যা তৃষ্ণা ও আসক্তি সৃষ্টি করে। তিনি মূর্ত আত্মাকে কর্মের সংযুক্তি দ্বারা আবদ্ধ করেন।

ভগবান এই শ্লোকে রজোগুণের স্বরূপ এবং তার বন্ধনের প্রকার জানিয়েছেন। রজোগুণ রাগ(আসক্তি)রূপ অর্থাৎ কোন বস্তু, ব্যক্তি,পরিস্থিতি, ক্রিয়া ইত্যাদিতে যে অনুরাগ জন্মায় সেই অনুরাগই হল রজোগুণের স্বরূপ। ভগবদ্গীতায় ভগবান ক্রিয়ামাত্রকেই গৌণরূপে রজোগুণ বলে মানলেও প্রধানতঃ কর্মের প্রতি আসক্তি অর্থাৎ অনুরাগকেই রজোগুণের রূপ বলে প্রকাশ করেছেন। তাই দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি আসক্তি পরিত্যাগ করে কর্তব্য-কর্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন। রাগপূর্বক কর্ম করলে তা আবদ্ধ করে অর্থাৎ মানুষ কর্মের প্রতি আসক্তি ও ফলেচ্ছাতেই আবদ্ধ হয়, কর্ম করলে নয়।

উদাহরণস্বরূপ গীতা পরিবারের দ্বারা আয়োজিত গীতার শ্লোক অধ্যয়নের সময় দেখা যায় যে প্রশিক্ষক সাধককে অডিও পাঠাতে বলেন এবং সাধকের আবৃত্তি শোনার পর তিনি সাধকের প্রশংসা করেন। অনেক সময় দেখা যায় যে কিছু সাধক পুনরায় প্রশংসা পাবার জন্য তানপুরা সহযোগেও শ্লোকের অডিও পাঠান। যদি কোন কারণ বশতঃ প্রশিক্ষক প্রশংসা না করেন, তাহলে সেই সাধক মানসিকভাবে বিচলিত হয় এবং ক্লাস করা বন্ধ করে দেন। যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এই যাত্রা শুরু করেছিলেন ফলাসক্তির প্রভাবে তাঁর যাত্রা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

‘তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্’ — অপ্রাপ্ত বস্তুতে অভিলাষকে বলা হয় **তৃষ্ণা** এবং প্রাপ্ত বস্তু, ব্যক্তি, পদার্থ ,ঘটনা ইত্যাদিতে আসক্তিকে বলা হয় **সঙ্গ**। তৃষ্ণা এবং সঙ্গ –উভয়ই রজোগুণের দ্বারা প্রাপ্ত হয়।

‘তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্’ — রজোগুণ কর্মের আসক্তি দ্বারা দেহী কে আবদ্ধ করে অর্থাৎ রজোগুণ বৃদ্ধি পেলে যেমন তৃষ্ণা ও আসক্তি বৃদ্ধি পায় তেমনই মানুষের কর্ম করার প্রবৃত্তিও বৃদ্ধি হয়। তাৎপর্য্য হল এই দুটিই একে অপরের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। কর্ম করার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পেলে মানুষ রাতদিন এই প্রবৃত্তিতেই আবর্তিত হতে থাকে। ফলস্বরূপ কর্মসুখ এবং কর্মফলের সুখের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি পায় এবং সেই আসক্তি দ্বারা রজোগুণ দেহীকে আবদ্ধ করে অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর আবর্তনে ঠেলে দেয়। এরূপ অবস্থায় মানুষ স্বীয় কল্যাণ ও উদ্ধার ইত্যাদি করার কথা ভুলে যায়।

সকামভাবে কর্ম করলেও একপ্রকার সুখ হয় এবং ফলাসক্তিতেও একপ্রকার সুখ হয়। এই কর্ম এবং ফলের সুখাসক্তিতে জীবাত্মা আবদ্ধ হয়ে যায়।

অনেক সময় দেখা যায় যে তৃষ্ণা অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তু লাভের অভিলাষ কর্মের প্রেরণা জোগায়। উদাহরণস্বরূপ কোন ছাত্রের যদি ভবিষ্যতে পদার্থ-বৈজ্ঞানিক হবার স্বপ্ন থাকে তাহলে সেই অভিলাষ পূরণের জন্য সে পরিশ্রম করে এবং লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য সে নাম যশ ও প্রশংসিত হয় এবং সেগুলো আরও বেশী পাওয়ার জন্য তার মনোবৃত্তিগুলো রাতদিন নতুন কর্মদ্যোগের চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে। নিজের কল্যাণ ও উদ্ধারের সময় তার থাকে না।

কর্মের সুখাসক্তি থেকে মুক্তি এবং নিজের কল্যাণের জন্য অনাসক্তভাবে কর্তব্য-কর্ম করলে সাধকের চিত্তে সাত্ত্বিক ভাব জাগরিত হয়। কর্ম এবং কর্মফলে আসক্তি না রেখে কর্তব্য-কর্ম করাকেই কর্মযোগ বলা হয় এবং কর্মযোগের সাহায্যেই মোক্ষ-প্রাপ্তি সম্ভব হয়।

14.8

তমস্ত্বজ্ঞানজং(ম্) বিদ্ধি, মোহনং(ম্) সর্বদেহিনাম্
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিঃ(স্), তন্নিবধ্নাতি ভারত॥8॥

আর হে ভরত অর্জুন! তমগুণ (আপনি) বিবেচনা করুন যা অজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত সমস্ত অবতারকে প্রলুব্ধ করে।

তিনি পরমানন্দ, অলসতা এবং ঘুমের দ্বারা (যারা দেহের সাথে তার সম্পর্কে বিশ্বাস করেন) আবদ্ধ করেন।

সত্ত্বগুণ ও রজোগুণের তুলনায় তমোগুণ অতি নিকৃষ্ট। এই তমোগুণ অজ্ঞান অর্থাৎ বোধহীনতা, মূর্খতা থেকে উৎপন্ন হয় এবং দেহীকে মোহগ্রস্ত করে রাখে অর্থাৎ সৎ-অসৎ,কর্তব্য-অকর্তব্যের জ্ঞান থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে। শুধু তাই নয়, এটি জাগতিক সুখভোগ এবং সম্পদ-সংগ্রহের কাজেও ব্যাপৃত হতে দেয় না অর্থাৎ রাজসিক সুখেও বঞ্চিত করে, সাত্ত্বিক সুখের তো কথাই নেই। যেমন একটি প্রজ্জ্বলিত আলোর উৎসকে যদি মোটা কম্বল দিয়ে ঢেকে রাখা যায় তাহলে সেই আলো অন্ধকারকে দূরীভূত করতে পারে না, তেমনই তমোগুণ জ্ঞান, বুদ্ধি, সুখ এবং সব ইতিবাচক অনুভূতিগুলিকে বিভ্রমের কম্বলে আচ্ছাদিত করে প্রকাশের পথে বাধার সৃষ্টি করে।

তমোগুণ প্রমাদ, আলস্য এবং নিদ্রার দ্বারা দেহীকে দেহে আবদ্ধ করে।

'প্রমাদ' দুপ্রকারে হয় — (১) কর্তব্য কর্ম না করা অর্থাৎ যে কাজের দ্বারা নিজের এবং জগতের হিতসাধন হয়, এরূপ কর্তব্য-কর্মগুলো না করা এবং (২) না করার যোগ্য কাজ করা অর্থাৎ যে কাজে নিজের এবং জগতের বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে অহিত হয়, সেরূপ কর্ম করা।

'আলস্য' – অর্থাৎ অলসতা। শুয়ে-বসে সময় কাটানো, প্রয়োজনীয় কাজ না করা এবং 'পরে করব' বলে কাজ ফেলে রাখা — এইসব অলসতার লক্ষণ।

'নিদ্রা' দুপ্রকারের হয় – (১) **আবশ্যিক নিদ্রা** – যা সুস্বাস্থের জন্য প্রয়োজন, যার ফলে শরীর ও মস্তিস্ক বিশ্রাম পায়। এরূপ নিদ্রা তমোগুণ নয়। (২) **অনাবশ্যক নিদ্রা –**যা শুধুমাত্র নিদ্রার জন্য নিদ্রা, যার ফলে শরীর অবসাদগ্রস্থ হয়, নিদ্রা ভাঙলেও শরীর ভারী বোধ হয়, পুরাতন স্মৃতি নষ্ট হয় ইত্যাদি। এরূপ নিদ্রা তমোগুণের লক্ষণ।

এইভাবে তমোগুণ প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা মানুষকে আবদ্ধ করে অর্থাৎ তার জাগতিক বা পারমার্থিক উন্নতির বাধা স্বরুপ হয়।

যদিও সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ — প্রকৃতিজাত এই তিনটি গুনই মানুষকে আবদ্ধ করে, কিন্তু এই তিনটির বন্ধনের প্রকারে পার্থক্য আছে। সত্ত্বগুণ সুখ ও জ্ঞানের আসক্তির দ্বারা এবং রজোগুণ কর্মাদির আসক্তির দ্বারা জীবকে আবদ্ধ করে । কিন্তু তমোগুণাশ্রিত আবদ্ধতা আসক্তির জন্য নয়। এটি স্বরূপতঃই বন্ধনকারী।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ – এই তিনটি গুণ পৃথক পৃথক থাকে না। ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে জীবের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। অনুপাতে যে গুণের পরিমান বেশী, সেই গুণটিই প্রকট হয়। উপরিউক্ত তিনটি গুণ প্রকৃতির কার্য এবং জীব স্বয়ং প্রকৃতি ও তার গুণাদি কার্য থেকে সর্বতোভাবে রহিত। গুণাদির সাথে সম্পর্ক করার জন্য জীব স্বয়ং নির্লিপ্ত, গুণাতীত হয়েও গুণাদির দ্বারা আবদ্ধ হয় । মানুষ স্বীয় চেষ্টা ও কর্মের মাধ্যমে তমোগুণকে রজোগুণে এবং রজোগুণকে সত্ত্বগুণে পরিবর্তন করে গুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয় এবং জন্ম-মৃত্যুর আবর্তন থেকে মুক্তিলাভ করে। সুতরাং সাধক নিজ প্রকৃত স্বরূপের দিকে লক্ষ্য রাখলেই গুণাদির বন্ধন হতে মুক্ত হতে সক্ষম হন।

হরিনাম সংকীর্তনের পর আজকের এই সুমুধুর বিবেচন সত্র সমাপ্ত হয় এবং তদ্‌পশ্চাৎ প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হয়।

::প্রশ্নোত্তর পর্ব::

প্রশ্নকর্তা: সূর্যকান্ত দাদা।
প্রশ্ন: নিম্নবর্তী শব্দসমূহের অর্থ কী ?

(১) চানঘ —- শ্লোক ৬

(২) নিবধ্নন্তি —- শ্লোক ৫

(৩)তন্নিবধ্নাতি —- শ্লোক ৭

উত্তর: (১) চানঘ — অর্থাৎ ' চ + অনঘ' । 'চ' এর অর্থ 'এবং'। অনঘ' শব্দের অর্থ হল নিষ্পাপ। ভগবান জানতেন যে তাঁর প্রিয় ভক্ত অর্জুন নিষ্পাপ, তাই তিনি অর্জুনকে এই শ্লোকে 'অনঘ' বলে সম্বোধন করেছেন।

(২) 'নিবধ্নন্তি' শব্দের অর্থ 'আবদ্ধ করা'। প্রকৃতিজাত ত্রিগুণের দ্বারা দেহী অর্থাৎ জীবাত্মা দেহে আবদ্ধ হয়। সেইজন্য এই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

(৩) তন্নিবধ্নাতি – তৎ +নিবধ্নাতি। 'তৎ' শব্দের অর্থ হল 'এটি' এবং 'নিবধ্নাতি' শব্দের অর্থ 'আবদ্ধ করে'। এখানে 'এটি' শব্দটি রজোগুণের বাচক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রশ্নকর্তা: রমাকান্ত দাদা
প্রশ্ন: স্বেদজ জীব কীভাবে উৎপন্ন হয়?
উত্তর: মুমুর্ষ রোগী বা কোন ব্যক্তি দীর্ঘদিন স্নানাদি না করলে বা অপরিষ্কার থাকলে তার ঘাম থেকে শরীরের চামড়ায় উকুন জাতীয় একপ্রকার পোকার জন্ম হয়। সেগুলোকে স্বেদজ জীব বলা হয়।

আমাদের বিশ্বাস যে আপনার এই বিবেচনাটি পড়ে ভালো লেগেছে। দয়া করে নিম্নে দেওয়া লিঙ্কটি ব্যবহার করে আপনার মূল্যবান মতামত দিন -

https://vivechan.learngeeta.com/feedback/

বিবেচন সারটি পড়ার জন্য, অনেক ধন্যবাদ!
আমরা সকল গীতা সেবী, এক অতুলনীয় প্রত্যাশা নিয়ে, বিবেচনের অংশগুলি বিশুদ্ধ ভাবে আপনার কাছে পৌঁছনোর প্রচেষ্টা রাখি। কোনো বানান বা ভাষারগত ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

জয় শ্রীকৃষ্ণ!
সংকলন: গীতাপরিবার – রচনাত্মক লেখন বিভাগ

প্রতি ঘরে গীতা, প্রতি হাতে গীতা!!
আসুন আমরা সবাই গীতা পরিবারের এই ধ্যেয় মন্ত্রের সাথে যুক্ত হয়ে নিজেদের পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের গীতাশ্রেণী উপহার হিসাবে পাঠাই।

https://gift.learngeeta.com/

গীতা পরিবার একটি নতুন উদ্যোগ নিয়েছে। এখন আপনি পূর্বে পরিচালিত সমস্ত ব্যাখ্যার (বিবেচনের) ইউটিউব ভিডিও দেখতে পারেন এবং PDF পড়তে পারেন। অনুগ্রহ করে নিচের লিঙ্কটি ব্যবহার করুন।

https://vivechan.learngeeta.com/

|| গীতা পড়ুন, পড়ান ,জীবনে গ্রহণ করুন ||

|| ওঁ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ||